৬.৫ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি
The measures taken by the Indian state to wipe-off the gender discrimination prevailing in Indian Society

দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে যে সামাজিক কাঠামোটি প্রচলিত আছে, সেটি বলা বাহুল্য, লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় যৌথ পরিবারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকরাও এদেশে প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনে তেমন একটা হস্তক্ষেপ করেনি। বিবাহ, পরিবার ব্যবস্থা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যে-নিয়ম ছিল, সেই নিয়মকেই মোটের ওপর বজায় রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু আইন বলতে ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা পরিচালিত নিয়মকানুনকেই বুঝত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ আমলেও ভারতীয় নারীদের পুরুষদের তুলনায় অধস্তন সামাজিক অবস্থানে বিরাজ করতে হয়। বলা বাহুল্য, মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বও ভারতীয় নারীর অসম সামাজিক অবস্থান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাননি। তাঁরা দেশ উদ্ধারের কাজে বীরাঙ্গনা নারীদের সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি যে নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহকোণ।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠন করা হল এবং গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হল। কিন্তু ধর্ম ও বৈষম্য ভিত্তিক চিরাচরিত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল। ফলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল থেকেই গেল এবং এই গরমিল সবচেয়ে বেশি প্রকট হল লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করা হল। সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নং অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের কথা বলা হল এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ১৬ নং অনুচ্ছেদ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা বলা হল। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিতে সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা এবং স্ত্রী-পুরুষের সমান কাজে সমান মজুরি প্রদানের কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু সংবিধানের কোথাও বলা

Scanned with CamScanner

হল না যে প্রচলিত ব্যবস্থায় ভারতীয় নারী যে সামাজিক অন্যায় অবিচারের শিকার হয় তার অবসান ঘটানো হবে। কোথাও বলা হল না যে, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক সমাজকাঠামোকে পরিবর্তন করা হবে। পরিবার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি ও নিয়মকানুনকে আগের মতোই বহাল রাখা হল। নেহেরু, আম্বেদকার প্রমুখ কোনো কোনো নেতা অবশ্য চেয়েছিলেন প্রচলিত হিন্দু আইনকে সংশোধন করে সম্পত্তি ও বিবাহের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে। এই মর্মে একটি প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। কিন্তু গোঁড়া হিন্দু প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায়, গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া তৎকালীন ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই চাইতেন প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোকে অটুট রাখতে।

পরবর্তীকালে **পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে** অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উদ্যোগে হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)-দুটি পাশ করে সম্পত্তি, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু মহিলাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানো হয় ঠিকই, কিন্তু নারী পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই আইন যথেষ্ট ছিল না। মুসলিম মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিতা মুসলমান মহিলাকে তার স্বামী খুব সহজেই 'তালাক' (divorce) দিতে পারত এবং উক্ত আইনে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ও তাঁর সন্তানদের খোরপোশের কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্বাধীন ভারতের উক্ত আইন অপরিবর্তিত থাকল। একটি মহিলার পক্ষে এই ধরনের আইনের ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৮৫ সালে **ঐতিহাসিক শাহবানু মামলার রায়ে** সুপ্রিমকোর্ট তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের খোরপোশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করলে সারা দেশের মৌলবাদী মুসলমানরা হৈ হৈ করে এর প্রতিবাদ করে। দেশের মুসলিম ভোটকে নিশ্চিত করার হীন স্বার্থে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধি সরকার মুসলিম শরিয়তি আইন, ১৯৮৬, পাশ করে মুসলিম মহিলাদের পুনরায় পূর্বেকার অসহায় অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে **খ্রিস্টান মহিলাদের** অবস্থাও তথৈবচ। ১৮৬৯ সালে প্রণীত আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা ছিল পক্ষপাতমূলক এবং মহিলা স্বার্থ বিরোধী। আজ পর্যন্ত সেই আইন অপরিবর্তিত থেকে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতে কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী খ্রিস্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মহিলাদেরই পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে বিরাজ করতে হয়।

ভারতবর্ষে নারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পক্ষপাতিত্বের আরও পরিচয় পাওয়া যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব সমান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মূলত নারীকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে, পুরুষকে নয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় নীতি অনুসরণে নারীকে বাধ্য করা হয়। কখনো কখনো সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং জোর-জবরদস্তির রাস্তা নিয়েছে। কর্মী নারীর অধিকার সংকুচিত করতে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় সন্তানের পর প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে নানাপ্রকার ক্ষতিকারক গর্ভনিরোধক ওষুধ বা অন্যকিছু নারীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় শরণার্থী নারীদের ওপর যৌন নিগ্রহ ছাড়াও নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক গর্ভ নিরোধক প্রয়োগের ঘটনা জানা যায়।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ভারতে নারী নির্যাতনে একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে রাষ্ট্রেরই। যে পুলিশের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, সেই পুলিশই সুরক্ষা দেওয়ার বদলে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এদেশে ধর্ষণকারীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পুলিশ ও মিলিটারি। মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টে একটি হেফাজতি ধর্ষণের মামলায় রায়দানকালে মুখ্য বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের পুলিশ দেশের সব থেকে বড়ো সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী।' (মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়— *'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নারীর মানবাধিকার'*)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে বা নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে ভারতে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিছু আইন প্রণয়ন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আইনকে যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হয় সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার।

Scanned with CamScanner